# হযরত আয়শা সিদ্দীকা

## রাযিয়াল্লাহু তা'লা আনহা

রাজিয়া দার্‌দ এম. এ.

বঙ্গানুবাদ

সাদেকা মুসার্‌রাত হক

প্রকাশনায়
লাজনা ইমাইল্লাহ্‌
বাংলাদেশ

# হযরত আয়শা সিদ্দীকা

## রাযিয়াল্লাহু তা'লা আনহা

মূলঃ রাজিয়া দার্‌দ এম. এ.

বঙ্গানুবাদ- সাদেকা মুসার্‌রাত হক

প্রকাশক | লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ
৪, বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১

গ্রন্থস্বত্ব | ইসলাম ইন্টারন্যাশনাল পাবলিকেশন্স লি., ইউ.কে.

লেখিকা | রাজিয়া দার্‌দ এম. এ.

ভাষান্তর | সাদেকা মুসার্‌রাত হক

প্রথম বাংলা প্রকাশ | যিলহজ্জ, ১৪৩৭
ভাদ্র, ১৪২৩
সেপ্টেম্বর, ২০১৬

সংখ্যা | ১০০০ কপি

মুদ্রণ | ইন্টারকন এসোসিয়েটস
৫৬/৫, ফকিরেরপুল বাজার
মতিঝিল, ঢাকা-১০০০।

---

**Hazrat Aysha[ra]**
**হযরত আয়শা (রা.)**

By **Razia Dard M. A.**

*Translation into Bengali by*
**Sadeka Musarrat Haque**

*Published by*
**Lajna Imaillah, Bangladesh**
4, Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211

© Islam International Publication Ltd.

ISBN : 978-984-991-327-6

بسم الله الرحمن الرحيم

# ভূমিকা

লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ কর্তৃক হযরত আয়শা সিদ্দীকা রাযিয়াল্লাহ্ তা'লা আনহার জীবনী সম্বলিত একটি পুস্তিকা প্রকাশিত হতে যাচ্ছে। মূল বইটি আহমদীয়া জামাতের কেন্দ্র রাবওয়া থেকে উর্দূতে প্রকাশিত। এর বাংলা অনুবাদ করেছেন আমাদের শ্রদ্ধেয়া বোন সাদেকা মুসার্‌রাত হক সাহেবা।

আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর একমাত্র কুমারী স্ত্রী ছিলেন হযরত আয়শা (রা.) তিনি রসূল (সা.)-এর সাথে মদীনার মসজিদে নববীর পাশে হুজরাতে থাকতেন। রসূল (সা.) কে তিনি সবচেয়ে নিকটে থেকে সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণ করেছিলেন। প্রখর মেধা, বুদ্ধি সম্পন্ন হযরত আয়শা (রা.)-এর বিষয়ে তাই রসূল (সা.) বলেছিলেন, 'ধর্মের অর্ধেক তোমরা আয়শার কাছ থেকে শিখো।'

তাই তার জীবনী আমাদের সবার পড়া দরকার।

**মোবাশশেরউর রহমান**
ন্যাশনাল আমীর
আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ

সেপ্টেম্বর, ২০১৬

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# দু'টি কথা

বাংলাদেশে আহমদীয়াতের শতবার্ষিকী উপলক্ষে মোহতরমা রাযিয়া দারদ এম. এ. সাহেবার উর্দূতে লেখা হযরত আয়শা (রা.) পুস্তিকাটির বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করার কথা থাকলেও নানা কারণে কয়েক বছর পিছিয়ে গেল। ইতিমধ্যে নিজ প্রভুর সান্নিধ্যে চলে গেলেন সে সময়কার উদ্যোগী মহীয়সী মহিলা সদর, লাজনা ইমাইল্লাহ, ইশরাত জাহান সাহেবা। পুস্তিকা প্রকাশনার কাজও থেমে গেল।

বর্তমান সামাজিক যোগাযোগ প্রযুক্তি ব্যবহারের ব্যপকতার ফলে উঠতি বয়সের ছেলে মেয়েরা হেন গর্হিত কাজ নেই যা তাদের মন মগজকে অবগাহন করে নৈতিক অধঃপতনের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। এ অধঃপতনের অতল গহ্বর থেকে প্রজন্মকে উদ্ধার করতে পুস্তিকার আলোচিত চরিত্র পুতুল প্রিয় গৌরবান্বিত এবং উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর পুণ্যময় জীবনের ঘটনাবলী পাঠ আলোক বর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়ার যুগোপযোগী পরামর্শে নাসেরাতের সিলেবাসে পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে দেরি হলেও পুস্তিকা প্রকাশ করতে উদ্যোগ নিয়েছি। আলহামদুলিল্লাহ। যথাযথ অনুমোদিত এ পুস্তিকাটি পাঠে বাংলা ভাষাভাষী লাজনা শাখার সকল সদস্যাগণ ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিকভাবে অনেক উপকৃত হবে বলে আমি বিশ্বাস পোষণ করি। এ পুস্তিকাটি প্রকাশে দেশের প্রায় ১২০টি লাজনা শাখার প্রায় ৬০০০ (ছয় হাজার) লাজনা নাসেরাত সদস্যা তরবিয়ত লাভের সুযোগ পাবে। ইনশা'ল্লাহ।

পুস্তিকাটি প্রকাশনার ব্যাপারে উর্দূ থেকে বাংলাতে ভাষান্তর, প্রুফ রিডিং এবং মুদ্রণে যে যেভাবে অবদান রেখেছেন তাঁদের সকলকেই মহান আল্লাহ তা'লা উত্তম পুরষ্কারে ভূষিত করুন। (আমীন)

রওশন জাহান
সদর
লাজনা ইমাইল্লাহ্, বাংলাদেশ।

সেপ্টেম্বর, ২০১৬ইং

# হযরত আয়শা সিদ্দীকা
## রাযিয়াল্লাহু তা'লা আনহা

এই পুস্তিকা এমন এক মহিলার জীবনাদর্শে সন্নিবেশিত যিনি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রী হবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন। যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) নিজে বলেছেন, "তোমরা ধর্মের অর্ধেক জ্ঞান আয়শা (রা.)-এর কাছ থেকে শিখো।" কতই না উচ্চ মর্যাদা ছিল এই গৌরবমণ্ডিত নারীর। সেই সত্তা যার জন্য এই বিশ্ব জগত সৃষ্টি হয়েছে এবং যিনি সৃষ্টির সাথে সৃষ্টিকর্তার সম্পর্ক স্থাপনের জন্য এবং মানবজাতিকে ধর্ম শিক্ষা দেয়ার জন্য এবং তাদের আত্মশুদ্ধির জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন তিনি হযরত আয়শা (রা.) সম্পর্কে বলেন, ইনি তোমাদেরকে অর্ধেক ধর্ম শিখিয়ে দেবেন। অর্থাৎ পুরুষ মহিলা দু'জনের মধ্যে অর্ধেক বিধিনিষেধ মহিলাদের জন্য হয়। মহিলাদের সম্পর্কে ধর্মীয় আহকাম তার নিকট থেকে শেখা যাবে। অতএব আমরা এমনটিই দেখতে পাই। হযরত আয়শা (রা.) যে প্রেম ও ভালবাসা এবং সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে মহানবী (সা.)-এর জীবনকে দেখেছিলেন এবং মূল্যায়ন করেছিলেন এবং মহানবী (সা.)-এর সাহচর্য লাভ করে তার থেকে তরবিয়ত লাভ করেছেন। যত বড় সংখ্যায় হাদীস হযরত আয়শা (রা.) বর্ণনা করেছেন তা তার উচ্চ মর্যাদা প্রকাশ করে। লাজনা ইমাইল্লাহর নতুন বছরে নাসেরাতুল আহমদীয়ার সিলেবাসে এই পুস্তকের প্রস্তাব করা হয়। সমস্ত লাজনা সংগঠন এই পুস্তক সংগ্রহ করুন, পড়ুন ও কন্যাদের পড়ান। যাতে তারা হযরত আয়শা (রা.)-এর জীবনের ঘটনাবলী পড়েন এবং নিজের কন্যাদের পড়ান। যেন তারা হযরত আয়শা (রা.)-এর জীবনের ঘটনাপ্রবাহ ও অবস্থা পড়ে তাঁর (রা.) নৈতিক চরিত্র, তাঁর কীর্তিসমূহকে নিজেদের হৃদয়ে গেঁথে নিয়ে সে অনুযায়ী অনুসরণ ও অনুকরণ করার চেষ্টা করতে পারেন।

আল্লাহ্ তা'লা লেখিকার উপরও নিজ রহমত নাযিল করুন এবং যারা পরিশ্রম করে বইটি প্রকাশে সাহায্য করেছেন তাদের উপরও রহমত নাযিল করুন।

**মরিয়ম সিদ্দীকা**
সদর লাজনা ইমাইল্লাহ্ রাবওয়া

# আয়শা সিদ্দীকা (রা.)

প্রিয় সোনামণিরা! আজ আরবের মরুভূমি আনন্দের বাজনা বাজিয়ে চলেছে, মক্কার মাটি সিদ্দীকে আকবর (রা.)-কে এক সিদ্দীকার সুসংবাদ দিচ্ছে, আকাশ গর্বিত ও মাটি উচ্ছসিত অর্থাৎ হযরত আয়শা (রা.) এই পবিত্র ভূমিকে আজ নিজ সৌন্দর্য্যে উজ্জ্বল ও আলোকিত করতে যাচ্ছেন।

## আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর জন্ম

মহানবী (সা.)-এর হিজরতের আট অথবা নয় বৎসর পূর্বে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। যে মহল্লা তাঁর জন্মের জন্য গর্বিত, তার নাম এখনও মান্‌কাল্লা। এটি পবিত্র মক্কা নগরীর একটি মহল্লা। হযরত সিদ্দীকে আকবার (রা.) যিনি হযরত আয়শা (রা.)-এর বুযূর্গ পিতা ছিলেন- এই মহল্লায় বাস করতেন। তার গৃহ দ্বারে আবুবকর (রা.) কিংবা কুব্বায়ে আবু বকর (রা.) নামে সুপরিচিত ছিল। এটি একটি বড় বাড়ি ছিল এতে একটি বড় গম্বুজও ছিল এবং এই গম্বুজের ভিতর হযরত আয়শা (রা.) যেখানে জন্ম গ্রহণ করেন সেখানে একটি বড় চত্বর আছে। কে জানতো এই শিশু কন্যা উম্মুল মোমেনিনের উপাধি লাভ করবেন এবং রসূল (সা.)-এর স্ত্রী হওয়ার গৌরব অর্জন করবেন। তিনি সেই ঘরে চোখ খুলেছেন যা পূর্বেই ইসলামের আলোতে আলোকিত হয়েছিল কারণ তাঁর জন্মের চার বছর পূর্বেই তাঁর বুযুর্গ পিতা হযরত আবু বকর (রা.) ইসলামের মত অমূল্য সম্পদে মালামাল হয়ে গিয়েছিলেন। জন্মের পরপরই তাঁর কানে আল্লাহু আকবার ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়েছে। ইসলাম ও আরবের প্রথা অনুযায়ী তাঁকে গোসল করিয়ে কাপড় পরানো হয়েছিল।

## নাম ও বংশ

এই পবিত্র শিশুটির নাম রাখা হলো আয়শা। তার উপনাম হলো উম্মে আব্দুল্লাহ্, উপাধী হলো সিদ্দীকা, পদবি হুমায়রা এবং আওয়ীশ প্রভৃতি। পিতার দিক থেকে কুরায়শ বংশের ছিলেন।

আবুল কাঈস-এর স্ত্রী সেই সৌভাগ্যবান মহিলা যিনি তাকে দুধ খাওয়ানোর সম্মান লাভ করেন।

## শৈশব

যদিও তিনি একমাত্র মেয়ে ছিলেন না কিন্তু হোনহার বিরওয়াকে চিকনে চিকনে পাত অর্থাৎ সম্ভাবনাময় চারাগাছের ঝকঝকে পাতা। তার পিতামাতা অন্যান্য সন্তানদের চেয়ে তাকেই বেশী পছন্দ করতেন। মা যেমন তাকে কলিজার টুকরা মনে করতেন তেমনি বাবা তাকে চোখের মণি মনে করতেন। তার সম্মান ও পবিত্রতার নূর কপাল থেকে বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। তিনি তার সমবয়সী মেয়েদের থেকে শারীরিক গঠনে, বুদ্ধি বিবেচনায়, চেহারা ও চালচলনে আলাদা প্রতীয়মান হতেন। গোত্রের সব মেয়েরা সাধারণত তাঁর কাছেই খেলতে চলে আসত। তিনি পুতুল খুব পছন্দ করতেন। এত পুতুল জমা করে রেখেছিলেন, গোত্রের সমস্ত মেয়ের নিকটও এত পুতুল ছিল না।

একবার হযরত আয়শা (রা.) স্বপ্নে দেখেন, তিনটি চাঁদ তার কোলে এসে পড়েছে। সকালে যখন বাবার কাছে এটি বললেন, তখন তার বাবা হযরত আবু বকর (রা.) সে মুহূর্তেই বুঝে গেলেন, তার কন্যা পৃথিবীর সব মহিলার মধ্যে এক সতন্ত্র মর্যাদা লাভ করবে এবং উন্নত মর্যাদা লাভ করবে। ফলে তার হৃদয়ে এই কন্যার প্রতি ভালবাসা আরও বেড়ে গেল।

প্রিয় সোনামনিরা! হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.) যখন ৫ বা ৬ বছর বয়সে উপনীত হন তখন প্রিয় নবী হযরত মোহাম্মদ (সা.) এক কঠিন ও সংকটময় যুগ পার করছিলেন। কাফেররা হুযূর (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র করতো। গরিব মুসলমানদের মরুভূমির তপ্ত বালুর উপর শুইয়ে বলা হতো মোহাম্মদ (সা.)-এর সঙ্গ ত্যাগ কর আর মূর্তিকে খোদা মেনে এগুলোর ইবাদত কর। সোনামণিরা! দেখ, এরা কত নির্বোধ ছিল, যেগুলো একটি মাছির ডানাও তৈরি করতে পারে না সেগুলোকে উপাস্য বানানোর জন্য বাধ্য করে এবং তারা এত অত্যাচার একারণে করে যে, এক খোদার ইবাদাত কেন করছে? কেন হযরত মোহাম্মদ (সা.)-কে খোদার রসূল মানে? শুধু মান্যকারীদেরই দু:খ-যাতনা দেওয়া হতো না বরং আমাদের প্রিয় নবীর উপরও পাথর ছোড়া হতো, ময়লা-আবর্জনা ফেলা হতো কিন্তু তিনি আকাশের দিকে তাকিয়ে চুপ হয়ে যেতেন এবং এ সকল অত্যাচার নীরবে সহ্য করতেন এমন সংকটময় সময়ে হযরত আয়শা (রা.)-এর

সম্মানিত পিতা হযরত আবু বকর (রা.) সর্বক্ষণ তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকতেন এবং সহযোগিতা করতেন।

প্রকৃতি হযরত নবী করিম (সা.)-এর ধৈর্যের পরীক্ষা নিচ্ছিল। এমন কঠিন সময় তাঁর পবিত্র স্ত্রী খাদীজা (রা.)-ও তাঁর সঙ্গ ছেড়ে এ পৃথিবী থেকে চির কালের জন্য চলে গেলেন, ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজিউন। তিনি এমন এক পবিত্র স্ত্রী ছিলেন যিনি দুঃখ, কষ্ট, বিপদে-আপদে সর্বোত্তম সঙ্গিনী ছিলেন।

একদিন শত্রুরা হুযূর (সা.)-কে অসাধারণ কষ্ট দিল, হুযূর (সা.) ঘরে আসলেন, ঘরে কেউ ছিল না। খাদীজা (রা.) তখন ছিলেন না যে সান্তনা দেবেন। সারা রাত আমাদের প্রিয় নবী ভারাক্রান্ত রইলেন। যখন ভোর হল তখন হাকিম বিন আল আওকাসের কন্যা ওসমান বিন মাযউন (রা.) প্রসিদ্ধ সাহাবীর স্ত্রী যার নাম ছিল খাওলা (রা.) রসূল (সা.)-এর খিদমতে হাজির হন। হুযূর (সা.)-এর অবস্থা দেখে তিনি নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য কুরবান। আপনি দ্বিতীয় বিয়ে করে নিন।

সোনামণিরা! তোমরা কি জান, আমাদের প্রিয় রসূল (সা.) কী জবাব দিলেন? তিনি (সা.) বললেন "খাওলা! খাদীজার মত সহমর্মী ও সমব্যাথি সেবিকা আর পাওয়া যাবে না।" খাওলা বললেন "না হুযূর এখনও মক্কায় এমন আরও মেয়ে এবং মহিলা বিদ্যমান যারা এমন গুণাবলির চেয়ে আরও অধিক গুণাবলির অধিকারিণী। যেমন, আবু বকর (রা.)-এর কন্যা আয়শা (রা.), এরপর সাওদা (রা.) আছেন।"

তিনি (সা.) কিছুক্ষণ নীরব থেকে বললেন, আচ্ছা এই দুই ঘরে প্রস্তাব নিয়ে যাও, আমি বারণ করছি না।

খাওলা সর্বপ্রথম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর ঘরে গেলেন। হযরত আয়শা (রা.)-এর সম্মানিতা মাতা উম্মে রুম্মান (রা.)-কে হুযূর (সা.)-এর পক্ষ থেকে প্রস্তাব দিলেন। তিনি বললেন এটি কীভাবে সম্ভব? রসূল (সা.) আবু বকর (রা.)-এর ধর্মের দিক থেকে ভাই। ফলে রসূল (সা.) আয়শার (রা.) চাচা হলেন আর চাচার সাথে সম্পর্ক কীভাবে হতে

পারে? তদুপরি অপেক্ষা কর আয়শার (রা.) বাবা বাইরে গেছেন তিনি আসলে তার সঙ্গে কথা বলে আমি জবাব দেব।

সোনামণিরা! এরই মধ্যে হযরত আবু বকার সিদ্দীক (রা.) এসে গেলেন। তিনিও একই জবাব দিলেন। এটি শুনে খাওলা আবার নবী করিম (সা.)-এর নিকট আসলেন এবং পুরো বৃত্তান্ত শুনালেন। প্রিয় নবী (সা.) সব শুনে বললেন "সিদ্দীক আকবরকে বল আমাদের ধর্মে এ সম্পর্ক বৈধ। তিনি আমার ধর্মীয় এবং মৌখিক স্বীকৃত ভাই, সত্যিকারের তথা সহোদর ভাই নন।"

এরপর খাওলা আনন্দচিত্তে ফিরে গিয়ে হুযূর (সা.)-এর বক্তব্য শোনালেন। এই উত্তর শুনে কে-ই-বা অস্বীকার করতে পারে। দুই পক্ষই সম্মত হল এবং সানন্দে এই সম্পর্ক কবুল করলেন। যখন খাওলা হুযূর (সা.)-এর খেদমতে হাজির হয়ে সমস্ত কথা ব্যক্ত করলেন তখন হুযূর (সা.) আবু বকর (রা.)-এর ঘরে গেলেন এবং নিকাহ হয়ে গেল। তখন হুযূর (সা.)-এর বয়স ছিল প্রায় পঞ্চাশ বছর আর হযরত আয়শা (রা.)-এর বয়স ছয়/সাত বছর।

যখন মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র নির্দেশে মক্কা ছেড়ে মদিনায় হিজরত করেন তখন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)ও হুযূরের সঙ্গে ছিলেন। তিনি পরবর্তীতে নিজ পরিবার পরিজনকে মদিনায় আনিয়ে নেন। এভাবে হযরত আয়শা (রা.)ও মায়ের সঙ্গে মদিনায় পৌঁছে যান। একদিন হযরত আবু বকর (রা.) আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আয়শার রুখসতে (মেয়ে উঠিয়ে দেয়াকে বলা হয়-অনুবাদক) কী বাধা? তিনি (সা.) বললেন, আমার কাছে দেন মোহর আদায় করার টাকা নেই। হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, হে আমার প্রভু আমার মাল ও ধন-সম্পদ কার জন্য? প্রিয় নবী বললেন, ঠিক আছে তাহলে আমাকে ধার দিন।

সুতরাং এমনই হল এবং তিনি (সা.) পরে তা পরিশোধও করে দেন। একদিন হযরত আয়শা (রা.) খেলায় নিমগ্ন ছিলেন। বান্ধবীরাও সঙ্গে ছিল। তাঁর মা তাঁকে ডেকে হাত ধরে কিছু আনসার মহিলার হাতে তুলে

দেন, তারা তাঁকে বধুর সাজে সাজিয়ে দিলেন। মহানবী (সা.) আগমন করলে তাঁর মা তাঁকে (রা.) নবী করিম (সা.)-এর হাতে উঠিয়ে দেন। সে সময় হযরত আয়শা (রা.)-এর বয়স নয় বছর ছিল।

তাঁর (রা.) বিয়ে অনাড়ম্বরভাবে হয়। এমনকি তাঁর বিয়ে ও রুখসাতানার অনুষ্ঠান আরবে প্রচলিত জাহেলিয়াতের কিছু নিরর্থক রীতি দূর করার কারণ হয়।

যেমন অরবরা শাওয়াল মাসকে অশুভ মনে করতো। এ মাসে বিয়ে শাদির কোন অনুষ্ঠান করতো না। কারণ ছিল, কোন এক সময় শাওয়াল মাসে আরবে প্লেগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল ফলে আরবরা এ মাসকে অশুভ মনে করতে শুরু করে। হযরত আয়শা (রা.)-এর বিয়ে এবং রুখসাতানা দু'টিই এই মাসে হয়। এভাবে আরবের কুপ্রথা দূর করার সূচনা তাঁর এসব অনুষ্ঠান থেকেই হয়।

রুখসাতানার সময় তিনি (রা.) তাঁর পুতুলগুলোও সঙ্গে নিয়ে আসেন। বান্ধবীদের সঙ্গে খেলা করতেন। রসূলুল্লাহ্ (সা.) যখন আসতেন তখন বান্ধবীরা লজ্জা পেয়ে লুকিয়ে যেত। কিন্তু তিনি (সা.) যখন বাইরে যেতেন তখন মেয়েদেরকে তাঁর কাছে পাঠাতেন। একবার হুযূর (সা.) এসে দেখেন তাকের উপর পর্দা দেওয়া সেখানে হযরত আয়শার পুতুলগুলো ছিল। বাতাসে পর্দা উড়ে গেলে রসূল (সা.) পুতুলগুলো দেখে বললেন এগুলো কী? হযরত আয়শা (রা.) উত্তর দিলেন, এগুলো আমার পুতুল। এগুলোর মাঝে হুযূর (সা.) একটি ঘোড়া দেখলেন যাতে কাপড়ের দুটি পাখনা লাগানো ছিল। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করলেন এটা কী? তিনি (রা.) বললেন, এটা ঘোড়া। হুযূর (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, এর উপর কি? বললেন, দু'টি পাখনা। রসূলুল্লাহ (সা.) বলেন, ঘোড়ারও কি পাখা থাকে নাকি? সোনামণিরা, হযরত আয়শা (রা.)-এর তাৎক্ষণিক উত্তর দেখ, তিনি বললেন, আপনি কি শোনেন নি হযরত সোলায়মান (আ.)-এর ঘোড়ার পাখা ছিল? এই উত্তর শুনে প্রিয় নবী (সা.) খুব হাসলেন। কত সরল এবং নিষ্পাপ পরিবেশ ছিল, কত ভালবাসা ছিল। তিনি (সা.) কখনও এই খেলা নিষেধ করেন নি। বয়সও কম ছিল আর পুতুল দিয়ে মেয়েরা বড় সুন্দর শিক্ষাও লাভ করতে পারে। যেমন সেলাই ফোঁড়াই শেখা হয়ে যায়। স্নেহ

ভালবাসা বাড়ে। সেজন্য তিনি (সা.) নিষেধ করবেন তো দূরের কথা তিনি কখনও অপছন্দের ভাবও প্রকাশ করেন নি।

তিনি (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-এর মৃত্যুর পর অনেক বিয়ে করেন। প্রত্যেকের মনস্তুষ্টির প্রতি খেয়াল রাখতেন কিন্তু হযরত খাদীজার পর হযরত আয়শা (রা.)-এর চেয়ে অন্য কোন স্ত্রী এত প্রিয় ছিলনা। এ ভালবাসা বাস্তবতা প্রসূত ছিল। মহানবী (সা.) সাধারণ লোকদের শিক্ষা দিতেন, তারা যেন নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে ভালো ব্যবহার করে কারণ, ইসলামের পূর্বে জাহেলিয়াতের যুগে আরবের লোকেরা মেয়েদের কোন মূল্যই দিত না বরং নারী জাতির প্রতি এমন ঘৃণা ছিল, অধিকাংশ মেয়েকেই জন্মের সাথে সাথে মেরে ফেলা হত। যেখানে অজ্ঞতা ও অত্যাচারের এমন প্রসার ছিল সেখানে যতক্ষণ পর্যন্ত ভালবাসা ও উত্তম আচরণের উৎকৃষ্ট আদর্শ দেখানো না হবে অন্যদের উপর কোন প্রকারের প্রভাবই পড়বে না। আমাদের নবী করীম (সা.) বলেছেন, যার দু'টি কন্যা সন্তান হয় এবং সে তাদের উত্তম শিক্ষা-দীক্ষা ও তরবিয়ত প্রদান করে, কিয়ামতের দিন সে জান্নাতের অধিকারী হবে। সন্তানকে হুকুম দিলেন 'মায়ের পদতলে জান্নাত'। স্বামীকে বললেন, তোমাদের মধ্যে উত্তম পুরুষ সে-ই যে নিজ গৃহের অধিবাসীদের কাছে উত্তম সাব্যস্ত হয়। মোট কথা তিনি (সা.) সর্ব প্রকারের নারী সে মা হোক অথবা মেয়ে কিংবা স্ত্রী হোক। নিম্নস্তর থেকে তুলে উন্নততর মর্যাদায় উন্নীত করেছেন। তিনি বলেন, নারীরা পাঁজর থেকে তৈরি তোমরা যদি জোর করে সোজা করতে চাও তাহলে ভেঙে ফেলবে। শুধু তোমাদের উত্তম আচরণ এই বক্রতা দূর করতে পারে। আসলে এ কারণেই তিনি (সা.) নিজের পবিত্র স্ত্রীদের সাথে উৎকৃষ্ট আচরণের আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেছেন যেন অন্যরাও তাঁর (সা.) অনুসরণ করতে পারে।

হযরত আয়শা (রা.) বলেন, আমি রসূল (সা.)-এর সাথে সফরে ছিলাম। আমরা দুজন দৌড় দিলাম আমি তাঁর (সা.) থেকে আগে চলে গেলাম। এরপর শরীর যখন একটু মোটা হয়ে গেল তখন তাঁর (সা.) সাথে দৌড়ালাম তখন তিনি (সা.) আমাকে পিছনে ফেলে দিলেন এবং বললেন, আয়শা এটা তোমার ঐ দিনের আগে চলে যাওয়ার বদলা হয়ে গেল।

আপনারা জেনে আশ্চার্য্যন্বিত হবেন, মদিনার যে বাড়িতে দুই জাহানের নেতা হযরত মুহাম্মদ (সা.) হযরত আয়শা (রা.)-এর সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করেন তা কাঁচা বাড়ি অর্থাৎ মাটির তৈরী ছিল। ছাঁদ এত নিচু ছিল যে, অনায়াসে মেঝেতে দাঁড়িয়ে যে কেউ ছাদ স্পর্শ করতে পারতো। একটি মাত্র দরজা ছিল যা মসজিদের দিকে খুলতো। এ বাড়িতেই বড় আনন্দের সাথে নিজের যৌবনের সময় কাটিয়েছেন, এবং কখনো কোন অভিযোগ-অনুযোগ করেন নি।

তিনি (রা.) পুরো সময় মহানবী (সা.)-এর সেবায় কাটিয়েছেন। আনুগত্যের বিষয়ে খুবই যত্নবান ও সচেতন ছিলেন। যথাসম্ভব প্রত্যেক সফরেই শরিক হতেন, যুদ্ধে সাগ্রহে অংশ নিতেন, শুধু অংশগ্রহণই করেন নি বরং অত্যন্ত সাহসিকতার সাথে যুদ্ধের ময়দানে আহতদের সেবা করেছেন, মলম পট্টি বেঁধে দিয়েছেন। মহানবী (সা.)ও হযরত আয়শা (রা.)-এর যথাসম্ভব প্রতিটি ব্যাপারে মন রক্ষা করতেন। একবার ঈদের দিন ঘরে প্রবেশ করে দেখেন ঘটা করে কবিতা ও ছন্দের সভা চলছে। আয়শা (রা.) মাঝখানে বসা আর আনসার মেয়েরা মনের আনন্দে গান গাইছে, আবৃত্তি করছে। তিনি (সা.) তাদেরকে কিছু না বলে অন্যদিকে মুখ করে বিছানায় শুয়ে পড়লেন। এরই মধ্যে হযরত আবু বকর (রা.) আসলেন এবং সভার এমন দৃশ্য দেখে মেয়ের উপর অসন্তুষ্টি প্রকাশ করতে লাগলেন। হুযূর (সা.) বললেন,

"আবু বকর! না, এদের কিছু বলো না, আজ ঈদের দিন এরাও নিজের আনন্দ পূর্ণ করলে কী ক্ষতি।"

হযরত আয়শা (রা.) ঘরের সকল কাজ নিজের হাতে করতেন। আটার খামির বানাতেন, নিজ হাতে খাবার তৈরি করতেন, মহানবী (সা.)-এর বিছানা সবসময় নিজ হাতে প্রস্তুত করে দিতেন এবং ভালভাবে দেখে নিতেন পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে কিনা। নিজ হাতে কাপড় ধুতেন। রাতে তাহাজ্জুদের জন্য নবী (সা.)-এর মাথার নিকট পানি, মিসওয়াক অবশ্যই রেখে দিতেন।

সোনামণিরা! স্বামীর দ্বিতীয় স্ত্রীকে সতীন বলে। সাধারণত মহিলারা সতীন পছন্দ করেনা। কিন্তু হযরত আয়শা (রা.) তার সব সতিনের সঙ্গে

ভালবাসার ব্যবহার করতেন। যখনই সুযোগ আসতো প্রশংসাই করতেন। হযরত খাদিজা (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রথম স্ত্রী ছিলেন তিনি কখনো তাঁকে দেখেনওনি কিন্তু তাঁর (রা.) ফযীলত, ইসলামের সেবা করার বিবরণ হযরত আয়শা (রা.)-এর পবিত্র মুখেই বর্ণিত হয়ে আমাদের নিকট পৌঁছেছে। এরই সঙ্গে এক আশ্চর্যজনক ও অবাক করা গুণ তার মধ্যে এটিও ছিল, যদি সতীনদের ব্যাপারে মহানবী (সা.) তাকে (রা.) কোন তিরস্কার করতেন, হযরত আয়শা (রা.) সেটিকেও গোপন করেন নি বরং বিষয়টি পরিস্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। এভাবে তিনি নিজের সততা ও বিশ্বস্ততার উন্নত মার্গের প্রমাণ দিয়েছেন।

খায়বার ও অন্যান্য যুদ্ধে বিজয়ের কারণে যখন গনীমতের মাল মদিনায় আশা আরম্ভ হয়। অভাবের যুগের অবসান হলো। তখন নবী (সা.)-এর পবিত্র স্ত্রীগণ রসূল (সা.)-এর নিকট দাবি করল, আমাদের গনীমতের মাল থেকে আমাদেরকেও কিছু দেওয়া হোক। তিনি তাদের এমন দাবি অপছন্দ করলেন। তিনি (সা.) এক মাসের জন্য সকল স্ত্রী থেকে পৃথক থাকা শুরু করলেন। ২৯ দিন পর হযরত আকদাস সর্ব প্রথম হযরত আয়শা (রা.) নিকট গেলেন এবং আল্লাহর নির্দেশনা শুনালেন,

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ اِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيٰوةَ الدُّنْيَا وَزِيْنَتَهَا فَتَعَالَيْنَ اُمَتِّعْكُنَّ وَاُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيْلًا ﴿٢٨﴾ وَاِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَالدَّارَ الْاٰخِرَةَ فَاِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْمُحْسِنٰتِ مِنْكُنَّ اَجْرًا عَظِيْمًا ﴿٢٩﴾

ইয়া আইয়্যু হান্নাবীঈয়্যু কুল্লে আযওয়াজিকা ইন কুনতুন্না তুরিদনাল হায়াতাদ্দুনিয়া ওয়া যীনাতাহা ফাতাআলাইনা উমাত্তি'কুন্না ওয়া উসাররিহ্ কুন্না সারাহান জামীলা ওয়া ইন কুনতুন্না তুরিদনাল্লাহা ওয়া রাসূলাহু ওয়াদ্দারাল আখিরাতা ফাইন্নাল্লাহা আ'আদ্দা লিলমুহসিনাতে মিনকুন্না আজরান আযীমা। (সূরা আল আহযাব: ২৯-৩০)

অর্থাৎ- হে নবী নিজের স্ত্রীদের বলে দাও যদি তোমরা দুনিয়ার (সাজসজ্জা) চাও তাহলে আস তোমাদেরকে পার্থিব সম্পদ দিয়ে দেই এবং উত্তমভাবে বিদায় করে দেই, আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূল এবং আখেরাতের জীবনের ঘর চাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে যারা

পরিপূর্ণ ইসলামের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে তাদের অনেক বড় পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখেছেন।

যখন এই নির্দেশ শোনালেন এবং সবখানে "বললেন" হবে, এর উত্তর চাই। হযরত আয়শা (রা.) তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন, 'আমার মালিক, আমি খোদা ও তাঁর রসূল এবং আখেরাতকে পছন্দ করি।' নবী (সা.)-এর চেহারা আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অন্যরাও এই একই উত্তর দিলেন। এই পরীক্ষায়ও হযরত আয়শা (রা.) উত্তীর্ণ ও কৃতকার্য হলেন।

এরপর হযরত আয়শা (রা.)-এর জীবনে সবচেয়ে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটল অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সত্তা এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে আল ইল্লীঈন-এর পানে উত্থিত হলো। সে সময় তার (রা.) বয়স মাত্র ১৮ বছর ছিল। আমাদের নবী (সা.) মোট ১৩ দিন অসুস্থ ছিলেন। তার মধ্যে ৮দিনই হযরত আয়শার নিকট ছিলেন। তিনি (রা.) মনে প্রাণে মহানবী (সা.) খিদমত করেছেন এমনকি হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর উরুতে মাথা রেখে দু'জাহানের নেতা মৃত্যুবরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলায়হে রাজেউন। আর হেদায়েতের ও সঠিক পথ প্রদর্শনকারী সূর্য চিরতরে আমাদের দৃষ্টির আঁড়ালে ম্লান হয়ে গেল।

এই পর্বতসম দুঃখের সময় তিনি (রা.) ধৈর্য ও অবিচলতার আদর্শ দেখিয়েছেন। বুক চাপড়ে কাঁদেন নি, কাপড়ও ছিঁড়েন নি আর চুলও ছিঁড়েন নি। কেবল হৃদয়ের অন্তস্থলে এক বেদনা নিয়ে **ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন** পড়ে নীরব হয়ে গেলেন।

তাঁর সবচেয়ে বড় শ্রেষ্ঠত্ব এটিও ছিল, তাঁর (রা.)পবিত্র ঘর রসূলে পাক রহমতুল্লিল আলামিন খাতামান্নাবীঈন (সা.)-এর শেষ বিশ্রামাগার ছিল। এতে যত গর্বই করা হোক কম হবে।

তিনি (রা.) স্বপ্নে দেখেছিলেন তিনটি চাঁদ তাঁর (রা.) ঘরে এসে পড়েছে। যখন নবী (সা.)-এর দাফন সম্পন্ন হলো তখন হযরত আবু বকর (রা.) বললেন, আয়শা! তিনটি চাঁদের মধ্যে এটি প্রথম চাঁদ ছিল এবং এই চাঁদটিই সবচেয়ে বড় ও সবচেয়ে উজ্জ্বল ছিল। আড়াই বছর পর হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-কে এতিম হওয়ার দুঃখও সহ্য করতে হলো। অর্থাৎ

তাঁর (রা.) পিতা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) মারা যান এবং দ্বিতীয় চাঁদও তাঁর (রা.) ঘরে এসে পড়লো। হযরত উমর (রা.)-এর যুগ তার (রা.) জন্য প্রশান্তি, স্বাচ্ছন্দ্য ও প্রাচুর্যময় ছিল। কিন্তু যা কিছুই আসত তিনি (রা.) গরিব ও এতিমদের মধ্যে বিতরণ করে দিতেন। এমনকি অনেক সময় রাতে খাবার মত কিছু থাকত না। এভাবেই হযরত আয়শা (রা.) নিজের পুরো জীবন কাটিয়ে দিয়েছেন।

যখন হযরত উমর (রা.)-এর উপর এক হতভাগা আক্রমণ করল এবং তাঁর বাঁচার কোন আশা রইল না। তখন তিনি (রা.) তাঁর ছেলেকে হযরত আয়শা (রা.)-এর নিকট এই অনুমতি নেবার জন্য পাঠালেন, যেন নিজের দুই প্রিয় বন্ধু অর্থাৎ হযরত নবী করিম (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর পাশে দাফন হওয়ার অনুমতি দিয়ে দেন। হযরত আয়শা (রা.) বললেন, **"এই জায়গাটি আমি নিজের জন্য রেখেছিলাম কিন্তু আজ আমি আমার সত্তার উপর উমর (রা.)-কে প্রধান্য দিচ্ছি।"**

সুতরাং হযরত উমর (রা.)-এর মৃত্যুর পর তাকেও হযরত আয়শা (রা.)-এর ঘরে দাফন করা হলো। এভাবে সেই তৃতীয় চাঁদও হযরত আয়শা (রা.)-এর ঘরের মাটির নিচে অদৃশ্য হয়ে গেল।

হযরত আমির মোয়াবিয়ার শাসনকালে জীবনের ১৮ বছর কাটিয়েছেন। তিনি তাঁর (রা.) ভক্তি, শ্রদ্ধা ও সম্মান করার ক্ষেত্রে সামান্য ত্রুটিও করেন নি। যখনই মদিনায় আগমন করেছেন হযরত উম্মুল মোমেনিন এর দুয়ারে হাজির হয়েছেন এবং ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন তিনি যেন তাকে কোন নসীহত করেন। এমনকি দামেস্ক থেকেও চিঠি লিখতেন যে, আমাকে কোন নসীহত করুন। একবার এমনই একটি পত্রের উত্তরে হযরত আয়শা (রা.) তাকে লিখলেন- 'আসসালামু আলায়কুম আম্মা বাদ- আমি মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মুখ থেকে শুনেছি তিনি (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের অসন্তুষ্টির পরোয়া না করে খোদার সন্তুষ্টির অন্বেষনকারী হবে খোদা তাকে মানুষের অসন্তুষ্টির মন্দ প্রভাব থেকে রক্ষা করবেন। কিন্তু যে ব্যক্তি খোদাকে অসন্তুষ্ট করে মানুষকে সন্তুষ্ট করতে চাইবে খোদা তাকে সেই মানুষদের হাতে সোপর্দ করে দেবেন যারা তার সাথে যেমন চাইবে ব্যবহার করবে।'

এটা কত মূল্যবান নসীহত ছিল, যা হযরত আয়শা (রা.) হযরত মোয়াবিয়া (রা.)-কে করেছিলেন। হযরত আয়শা (রা.) ৬৭ বছর বয়সে হযরত মোয়াবিয়ার (রা.) মৃত্যুর দুই বছর পূর্বে মদিনায় ইন্তেকাল করেন। পবিত্র রমজান মাসের শুরুতে অসুস্থ হন লোকজন খবর নিতে আসলে প্রত্যেককেই জবাব দিতেন ভালো আছি। অবশেষে সেই সময় উপস্থিত হলো প্রত্যেক মানুষকে যার সম্মুখীন অবশ্যই হতে হবে। মহানবী (সা.)-এর প্রিয় প্রেমাস্পদ স্ত্রী অতি উচ্চ মর্যাদা সম্পন্ন সাহাবীদের শিক্ষয়িত্রী ৫৮হিজরি সনে রমজানুল মোবারকের ১৭ তারিখ রাতে দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন।

পুরো শহর ভেঙ্গে পড়লো এ সমবেত লোকদের এমন একজনও ছিল না যার চোখ অশ্রুসিক্ত হয় নি। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) যিনি মহানবী (সা.)-এর প্রখ্যাত সাহাবী ছিলেন হযরত মোয়াবিয়ার পক্ষ থেকে মদিনার প্রশাসক ছিলেন, তিনি হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর জানাযার নামায পড়ান। জান্নাতুল বাকীতে তাঁকে সমাহিত করা হয়।

সেই রাত ছিল মদিনাবাসীর জন্য কিয়ামত সদৃশ। কারণ, সে দিন নবী (সা.) স্ত্রী হিসাবে উজ্জ্বল প্রদিপ চিরদিনের জন্য নিভে গেল। সেদিন শুধু মুসলমানদের স্নেহময়ী জননীরই মৃত্যু হয় নি বরং সাহাবায়ে কেরামদের (রা.) বিচক্ষণ শিক্ষিকাও এ দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়ে বেহেস্তে প্রবেশ করেছেন। অতএব মদিনাবাসী যতবেশী দুঃখ প্রকাশ করুক যতবেশি ভারাক্রান্ত হোক তা অপর্যাপ্ত ছিল। সকল উম্মাহাত তথা জননীদের মধ্যে তিনি যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করেছিলেন সেটা আর কেউ অর্জন করেন নি।

তিনি (রা.) প্রাণোচ্ছল, উত্তম স্বভাব, তিক্ষ্নধী শক্তির অধিকারী ও বিচক্ষণ, ইত্যাদি বিশেষ গুণের অধিকারিণী ছিলেন, দানশীলতা ও বদান্যতার ক্ষেত্রে তার (রা.) দ্বিতীয় কেউ ছিল না। কখনো এমন হতো, একদিনেই ৭০ হাজার দিরহাম দান করে দিতেন। গীবত ও গালমন্দ করা থেকে তাঁর (রা.) চরিত্র সম্পূর্ণ পবিত্র ছিল। সুললিত কণ্ঠ পছন্দ করতেন। একবার কোথাও বাইরে গিয়েছিলেন, নির্ধারিত সময়ের চেয়ে তিনি দেরিতে ফিরলেন। হুযূর (সা.) বিলম্বের কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, "আমি আসছিলাম, দেখি এক ব্যক্তি সুললিত কণ্ঠে কুরআন তেলাওয়াত

করছে, দাঁড়িয়ে অনেক্ষণ তার তেলাওয়াত শুনতে থাকি" তিনি (সা.) বললেন, চলো আমিও শুনব। প্রিয় নবী (সা.) গেলেন, তিলাওয়াত শুনে খুব পছন্দ করলেন এবং বললেন, সকল প্রশংসা আল্লাহ্‌র আমার উম্মতেও এমন সুরেলা কণ্ঠের ব্যক্তি আছে। কেউ যদি উপঢৌকন স্বরূপ কিছু নিয়ে আসত তাহলে তিনিও তাকে কিছু পাঠাতেন। নরম হৃদয়ের অধিকারী ছিলেন। অপারগতার কারণে কোন নেকি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হলে কান্না শুরু করে দিতেন। গোলাম ও দাসী কিনে মুক্ত করে দিতেন। এতিমদের মাথায় স্নেহ ভরে হাত বুলাতেন। অভিভাবকহীন মেয়েদের নিয়ে লালন পালন করার তার খুব আগ্রহ ছিল। তিনি ৬৭ জন গোলাম ক্রয় করে মুক্ত করেছেন। পর্দার হুকুম নাযিল হওয়ার পর কঠোরভাবে তা পালন করেছেন। কখনো কোন না-মহরম এর সম্মুখে বের হন নি। একবার এক অন্ধ ব্যক্তি তার (রা.) সম্মুখে আসলো তিনি তার সাথে পর্দা করলেন। সে আশ্চর্য্যান্বিত হয়ে জিজ্ঞেস করল উম্মুল মুমেনীন আমার থেকে পর্দা করার কী আছে আমি তো দেখতে পাই না, আয়শা (রা.) বললেন, আমি তো দেখতে পাই। নিজের ঘরে একটা পর্দা টানিয়ে রেখেছিলেন, কোন সাহাবি মাসলা জিজ্ঞেস করতে আসলে তিনি পর্দার পিছন থেকে তার সঙ্গে কথা বলতেন। তার মৃত্যু পর্যন্ত এই নিয়মই বহাল ছিল। জঙ্গে জামালেও তিনি পর্দা না করে সিপাহিদের সামনে আসেন নি। পর্দার বিশেষ খেয়াল রেখেছেন। তার পর্দার সীমারেখা এমন ছিল, যখন হযরত ওমর (রা.) মারা যান এবং তাঁর সম্মতি নিয়ে, মহানবী (সা.) ও হযরত আবু বকর (রা.)-এর সঙ্গে তাঁর ঘরে দাফন হলেন তখন হযরত আয়শা (রা.) বলতেন, এখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র মাজারে পর্দা না করে যেতে লজ্জা লাগে। কারণ, সেখানে ওমর (রা.) সমাহিত আছেন- কত বাধ্য বাধকতা করেছেন পর্দার অথচ মৃতরা হাজার মন মাটির নিচে থাকে, দেখতেও পায়না, শুনতেও পায়না। তারপরও পর্দা ও লজ্জার বিষয়ে এমন সচেতন ছিলেন। এরপর তিনি (রা.) বলেন, হজ্জের সময় যখন আমরা মহানবী (সা.)-এর সঙ্গে এহরাম বেঁধে হাঁটতাম যখন কাফেলার লোকেরা আমাদের নিকটবর্তী হতো আমরা আমাদের মুখ ঢেকে নিতাম। যখন কাফেলার লোকেরা অতিক্রম করে চলে যেত তখন মুখ উন্মুক্ত করতাম। পর্দার বিষয়ে তিনি কত সচেতন ছিলেন এ থেকে স্পষ্ট জানা যায়।

সকল উম্মাহাতুল মোমেনীনের মধ্যে তিনি যেসব বিশেষত্বের অধিকারী ছিলেন সেগুলোর বর্ণনা তার ভাষায় শুনুন। তিনি বলেন,

১- আমার ছবি রেশমি কাপড়ে জড়ানো অবস্থায় দুইবার হযরত নবী করীম (সা.)–কে দেখানো হয়েছে এবং বলা হয়েছে, এ তোমার স্ত্রী হবে দুনিয়া ও আখেরাতে।

২- আমি ছাড়া আর কোন মহিলা কুমারী অবস্থায় হুযূর (সা.)-এর স্ত্রী হয়ে আসেন নি।

৩- আমার ঘরে রসূল (সা.) সমাহিত হয়েছেন।

৪- আমার এখানে জিব্রাইল ওহী নিয়ে আসতেন। একবার রসূলুল্লাহ (সা.) বললেন, আয়শা জিব্রাইল তোমাকে সালাম বলছে অতএব আমি জবাবে বললাম তাকেও আমার সালাম দিন কেননা আপনি যা কিছু দেখেন আমি তা দেখিনা।

৫- আমি সেই মহান মানুষের মেয়ে যাকে সমস্ত মুসলমানদের মধ্য থেকে খোদা তাঁর রসূলের সঙ্গে হিজরতের সময় সওর গুহায় রসূল (সা.)-এর খিদমতের সৌভাগ্য দান করেছেন।

৬- শেষ অসুখের সময় হুযূর আকদাস এটাই চেয়েছিলেন যে, তিনি (সা.) আয়শা (রা.)-এর গৃহে অবস্থান করবেন। এভাবে অসুখের তের দিনের মধ্যে আট দিন তার (রা.) গৃহে কাটান।

মহানবী (সা.)-এর একটি হাদীসের কারণে হযরত আয়শা (রা.) জ্ঞান, যোগ্যতা এবং ফযিলতের দিক থেকে অধিক সম্মানিত। হযরত জুবায়ের (রা.)-এর ছেলে হযরত উরওয়াহ (রা.) থেকে বর্ণিত, তিনি (সা.) বলেন, আমি শরীয়তের হালাল-হারাম কুরআনের জ্ঞান, ধর্মীয় ফারায়েয, ফিকাহ্ শাস্ত্র, কাব্য, চিকিৎসা বিদ্যা, আরবের ইতিহাস ইত্যাদিতে আয়শা (রা.)-এর চেয়ে অধিক জ্ঞানী কাউকে পাইনি।

একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করা হল, ধর্মীয় জ্ঞান আপনি রসূলুল্লাহ (সা.) থেকে শিখেছেন, আরবের বিখ্যাত কবিদের হাজার হাজার কবিতা মুখস্ত করেছেন, কিন্তু এটা বলুন, চিকিৎসা শাস্ত্র আপনি কার কাছ থেকে

শিখলেন? তিনি (রা.) উত্তর দিলেন, "আরবের যে সকল চিকিৎসক বিভিন্ন সময় মহানবী (সা.)-এর খিদমতে আসা যাওয়া করতেন আমি চিকিৎসা জ্ঞান তাদের থেকে অর্জন করেছি"।

বড় বড় সাহাবা (রা.) ধর্মীয় বিষয়াদি তাঁর নিকটই জানতে আসতেন। ইমাম জুবায়রি থেকে হাকেম বর্ণনা করেন, যদি বর্তমান সব পুরুষের জ্ঞান ও গুণ এক জায়গায় একত্রিত করা হয় এবং তারপর এর সাথে নবী (সা.)-এর সকল স্ত্রীদেরও যোগ করা হয় তখনও হযরত আয়শা (রা.)-এর গুণ ও শ্রেষ্ঠত্ব তাদের সামগ্রিক জ্ঞান থেকে অধিক ছিল।

প্রিয় সোনামণিরা! কেনই বা হবেনা, হযরত আয়শা (রা.) সেই পূর্ণতাপ্রাপ্ত মানব (সা.)-এর স্ত্রী ছিলেন যিনি পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ নৈতিক শিক্ষা দানকারী শিক্ষক ছিলেন এবং সেই সিদ্দীকে আকবরের মেয়ে ছিলেন যিনি নিজের প্রিয় বন্ধু রসূল (সা.)-এর সবচেয়ে বড় প্রেমিক ছিলেন।

হযরত আয়শা (রা.) সম্মানিত পিতার তরবিয়ত এবং পবিত্র স্বামীর শিক্ষা পূর্ণভাবে লুফে নিয়েছেন। এবং প্রকৃতিগত ভাবেও তিনি ভীষণ নেক ও স্বচ্ছ ছিলেন। তাই তিনি নৈতিক চরিত্রের সেই উন্নত মার্গ পর্যন্ত পৌঁছেছেন যা পূর্বেই কুদরত ঠিক করে রেখেছিল।

মোটকথা প্রিয় সোনামণিরা! সকল প্রশংসিত গুণাবলিতে হযরত আয়শা সিদ্দীকা (রা.)-এর কোন তুলনা ছিল না। হাজারো সালাম ও দুরুদ তাঁর উপর বর্ষিত হোক।

আসসালামু- হে আয়শা সিদ্দীকা উম্মুল মুমেনীন,

সিদ্দীকে আকবরের কন্যা, ধর্ম সম্রাটের স্ত্রী।

ওয়া আখেরু দা'ওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহে রাব্বিল আলামীন।

**–ঃ সমাপ্ত ঃ–**

## Hazrat Ayesha Siddiqa$^{ra}$

It is a privilege for Lajna Imaillah, Bangladesh to publish the Bangla translation of the booklet titled 'Hazrat Ayesha Siddiqa (ra)'.This brief but very precisely narrated booklet was written by Mrs. Razia Dard, a renowned teacher and an educationist of Rabwah. The writer has depicted effectively the moral and spiritual heights, depths and charms embedded in the character of Hazrat Ayesha (ra). The aim and objective is to spiritually uplift and inspire our sisters to adapt the high qualities and attributes of Hazrat Ummul Mumineen Ayesha Siddiqa (ra). We are confident, this will be a source of inspiration to many of us and specially for the youngstars, inshaAllah.

Sister Sadeqa Musarrat Haque has completed the translation with sincere efforts and enthusiasm. May Allah reward her immensely for her endeavors and make this a source of blessings for all, Ameen.

*© Islam International Publication Ltd.*

ISBN 978-984-991-327-6

9 789849 913276